

মুক্তমন ও মুক্তমনা - ৩

প্রদীপ দেব

১

পাঁচ বছর পূর্ণ হচ্ছে মুক্তমনা। ২০০১ থেকে ২০০৬। পাঁচ বছরে মুক্তমনা ফোরামের ২৬৪৯ জন (৭ এপ্রিল ২০০৬ পর্যন্ত) সদস্য সহ আরো অনেক সচেতন মানুষের মন কেড়েছে এই মুক্তমনা পরিবার। ইন্টারনেটে আরো অনেক অনলাইন ফোরাম আছে। বাংলাভাষাতেও আছে অনেকগুলো। তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। আর সে প্রক্রিয়ায় আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় মুক্তমনা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে স্মার্ট ফোরাম।

স্মার্টনেস অর্জন করতে সময় লাগে, পরিশ্রম করতে হয় প্রচুর। কিন্তু অর্জিত স্মার্টনেস ধরে রাখতে গেলে পরিশ্রম করতে হয় আরো বেশি। নিয়মিত চর্চায় ঝরিয়ে ফেলতে হয় অপ্রয়োজনীয় মেদ। মুক্তমনা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে মনে হচ্ছে কিছু গোপন মেদ জমে গেছে উদারতার সুযোগে। কেন মনে হচ্ছে তা বলছি।

মুক্তমনায় সম্প্রতি ফরিদ আহমেদের লেখা এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি লেখা পড়ে মনে হলো - কিছু কিছু লেখকের লেখা মুক্তমনার পাতায় স্থান পাবার যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আমি ফরিদ আহমেদের সাথে একমত। মুক্তমনার গাইডলাইন অনুযায়ী শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক লেখা মুক্তমনায় থাকা উচিত নয়।

মুক্তমনার লেখকদের অনেকেই সত্যিকারের মুক্তমনা। কিন্তু কেউ কেউ ছদ্মমুক্তমনা। ছদ্মমুক্তমনাদের লেখা পড়লেই বোঝা যায় - তাঁরা অনেকসময় যা লেখেন তা বিশ্বাস করেন না, চর্চা করেন না। কেউ কেউ ছদ্মনামে লেখেন, ছদ্ম লৈজিক পরিচয়েও লেখেন। কোন বিষয়ে একাডেমিক আলোচনা যখন হয়, তখন কে বলছেন - এর চেয়েও জরুরি হলো কী বলছেন। কিন্তু যুক্তির অস্ত্র ভেঁতা হয়ে গেলে যারা ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেন- তখন তাঁদের ক্ষেত্রে কী - এর চেয়ে কে-র গুরুত্ব বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এরকম শালীনতাবর্জিত ব্যক্তিগত আক্রমণকারীরা মেরুদণ্ডহীন ছদ্মবেশী জীবাণুর মত। সুস্থতার প্রয়োজনেই তখন তাদের পরিচয় উন্মোচনের দরকার হয়।

আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি বাঙালি ছাড়াও আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীর সাথে মিশেছি। কিন্তু বাঙালির মত এত বেশি অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রবণতা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখিনি। এটা হয়তো আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কারণেই হয়েছে। অথবা আমাদের প্রয়োজনীয় যুক্তিবোধের অভাবের কারণেই হয়েছে। জাতিগত ভাবে আমরা কাজের চেয়ে কথা বলি বেশি, এবং কেউ যদি কথার চেয়ে কাজ বেশি করতে চায় - তাহলে তার কাজ পস্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগি। কিন্তু এ সংস্কৃতি বদলানো উচিত এবং তা যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই ভালো।

দেখা যাচ্ছে মুক্তমনায় যে কেউ যে কোন প্রসঙ্গো লিখতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন। এটা নিঃসন্দেহে মুক্তমনার মুক্ত গণতন্ত্র ও ভিন্নমতসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কিন্তু কেউ কেউ এ ভদ্রতার সুযোগ নিচ্ছেন। গালিগালাজও করছেন মুক্তভাবেই। সে তাঁরা করতেই পারেন। রুচির ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু একটা ওয়েবসাইটে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। যাঁরা ভালো তাদের মধ্যে কেউ কেউ খারাপ হবার সুযোগের অভাবে ভালো থাকেন। সেজন্য মুক্তমনারও উচিত আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের আচরণগত বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করা। কারণ স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তো সবার থাকে না। এ নিয়ন্ত্রণটি মডারেটরেরই করা উচিত।

বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার খবর ও গবেষণাপত্র ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর মধ্যে যেগুলো রেফারিড (refereed) জার্নালে প্রকাশিত হয়, কেবল সেগুলোই সত্যিকারের গবেষণাপত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সবচেয়ে বড় অনলাইন আর্কাইভ লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবের আর্কাইভে নির্ধারিত নিয়ম মেনে যে কেউ গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক, অবৈজ্ঞানিক, প্রমাণিত অসম্ভাব্যতার (Proved impossibility) অভিযোগ ওঠে তখন তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট পেপারটি আর্কাইভ থেকে মুছে দেয়া হয়। আমি মনে করি মুক্তমনায়ও সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাতে আমাদের রুচির বিকারের বদলে বিকাশ ঘটবে, শিক্ষার প্রসার ঘটবে, মনের যুক্তিতে আমরা আরো এগিয়ে যাবো। এটাই তো আমরা চাইছি - তাই না?

২

মুক্তমনায় পাঁচ বছর পিছিয়ে আছি আমি। সাথে চলার জন্য তাই ছুটতে হচ্ছে বেশ। প্রায় প্রতিদিনই পড়ছি মুক্তমনা আর্কাইভের লেখাগুলো। গত এক সপ্তাহে অনেকগুলো লেখা পড়লাম। তার মধ্য থেকে দুটো লেখার উল্লেখ করছি এখানে। আমার মনে হয়েছে এ লেখা দুটোতে আমার মত অনেকের মানসিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। লেখা দুটোর একটি হলো শবনম নাদিয়ার **Why I Remain an Atheist**, অন্যটি হলো জাহেদ আহমেদের **My Experience With Islam**। শবনম নাদিয়ার লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়েছে ১৮ জুলাই, ২০০১। এর মধ্যে কেটে গেছে প্রায় পাঁচবছর। আজকের শবনম নাদিয়া নিশ্চয় আরো বেশি পরিণত, আরো বেশি যৌক্তিক। তাঁর লেখায় তিনি বলেছেন তাঁর নাস্তিক হবার ব্যক্তিগত কারণ। এখন নিশ্চয় তাঁর ব্যক্তিগত কারণের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাগতিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ যুক্ত হয়েছে। জাহেদ আহমেদের লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে ১০ জুন, ২০০৩। জাহেদ আহমেদ বর্ণনা করেছেন ধর্মীয় পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর মানবতাবাদী হয়ে ওঠার কাহিনী। একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, তাহলো ভারতে গিয়ে হিন্দু মেয়েটির প্রেমে না পড়লে কি তিনি মানবতাবাদী হতেন না? প্রশ্নটি অবাস্তব - তা বুঝতে পারছি। কারণ, কী হলে কী হতে পারতো - টাইপের প্রশ্ন আসলে কোন যৌক্তিক প্রশ্ন নয়। তবুও আমি জানি আজকের জাহেদ আহমেদ সুনির্দিষ্ট ধর্মের গন্ডির বাইরে এসে বিশ্বমানবতার হাত ধরে এগোবার আরো অনেক কারণ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক ধর্মকেই নিজের ধর্ম হিসেবে পালন করে আসছে। গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন করা সব ধর্মেই নিষেধ। এই নিষেধের বেড়া জাল আজ একটু একটু হলেও ভেঙে পড়ছে - এটাই আমাদের জন্য সুখের বিষয়।

৩

আলৌকিক শক্তির প্রার্থনায় যে কোন কাজ হয়না তা প্রমাণিত সত্য। তারপরও এ নিয়ে যখন কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে তখন তার ফলাফলের প্রতি কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। সেরকম একটি গবেষণা ও তার ফলাফল নিয়েও সাম্প্রতিক একটা বিতর্ক চলছে মুক্তমনাদের মধ্যে। পার্থ ব্যানার্জি এরকম পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নের উত্তরে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাহেদ আহমেদ আর অভিজিৎ রায়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি - তা হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যে ধরণের মুক্তমন দরকার হয় - প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশ্বাসীদের তা সেরকম ভাবে থাকে না। বিজ্ঞানী পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে সন্তুষ্ট না হলে পরীক্ষাটা বার বার করেন, সততার সাথে করেন। কিন্তু কোন ভাবেই লব্ধ ফলাফলে কারচুপি করেন না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটি এত বেশি গভীরে প্রোথিত থাকে যে গবেষণার ফল নিজের বিশ্বাসের পক্ষে গেলে তাতে খুব উল্লসিত হন, কিন্তু বিশ্বাসের বিপক্ষে গেলেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। এ অবস্থায় যুক্তির যুদ্ধ ঠিক জমে না। নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর মাঝেও আমি এরকম কিছু পৌঁড়ামি দেখেছি। প্রফেসর আবদুস সালাম তাঁর সব বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় প্রদর্শিত স্লাইডের উপরে *সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তালার* লিখে রাখতেন। নাসায় কর্মরত অনেক বৈজ্ঞানিক গড্‌স উইলে বিশ্বাস করেন। তবে সুখের বিষয় যে তাঁরা কোন প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য গডকে দায়ী করে বসে থাকেন না।

৪

যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসীরা তিনটি অবস্থান নেন। শুরুতে তাঁরা বলেন, এরকম আবিষ্কার ঈশ্বরের পছন্দ নয়। স্টেম সেল গবেষণার বিষয়ে সেরকম কথাই হচ্ছে। কিছুদিন পরে তাঁরা বলতে থাকেন, এ আবিষ্কার ঈশ্বরের একটি পরীক্ষা, কিন্তু তা টিকে থাকবে না। কিন্তু যখন টিকে যায় - তখন তাঁরা বলতে শুরু করেন যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে এ আবিষ্কারের কথা অনেক আগেই লিপিবদ্ধ করা আছে, সুতরাং বিজ্ঞানীরা নতুন কিছুই আবিষ্কার করেন নি। অতি সম্প্রতি জৈব বিবর্তনের আরো একটি মিসিং লিংক আবিষ্কৃত হয়েছে। সামুদ্রিক মাছ থেকে পায়ে হেঁটে চলার প্রাণীর মধ্যবর্তী ধাপের ফসিল পাওয়া গেছে। বিবর্তনের এরকম নতুন প্রমাণকেও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইবেন অনেকে। যখন পারবেন না, তখন মহাকোষের খুলে দেখানোর চেষ্টা করবেন যে এ আবিষ্কারের কথাও লেখা ছিলো সেখানে। যেমন করছে Does God Exist (www.doesgodexist.org) নামে বিশাল একটি খ্রিস্টান সংগঠন। এদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে মেশার সামান্য সুযোগ আমার হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আগামী পর্বে।

এপ্রিল ৭, ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া